আমার নাম সুব্রত রায়হান। আমার এই নাম রেখেছিলেন আমার বাবা। এই নামটা অবশ্য আমার কাগজে-কলমের নাম। বাবা আমাকে কখনোই পুরো নাম ধরে ডাকেননি। বাবা ডাকতেন 'সুবোধ' বলে। তিন অক্ষরের সুবোধ। আমাকে নিয়ে বাবার স্বপ্নটা ছিল অন্যরকম। মানুষের বাবারা স্বপ্ন দেখেন তাদের ছেলে ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে, আমার বাবা স্বপ্ন দেখতেন আমাকে মহাপুরুষ বানাবেন।

বাবার ধারণা ছিল ছেলে-মেয়েদের যেভাবে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানানো যায়, ঠিক সেভাবেই মহাপুরুষ হিসেবেও গড়ে তোলা যায়। আমার শৈশব কেটেছে তাই মহাপুরুষ হওয়ার বিভিন্ন কলাকৌশল আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে। মা মারা যাওয়ায় আমাকে মহাপুরুষ বানানোর জন্যে বাবার এই নানামুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাধা দেয়ার কেউই ছিল না। বাবা আর আমার সংসারে আমি ছিলাম বাবার আদরের গিনিপিগ।

আমি শৈশব পার করলাম, কিশোর হলাম, তারপর তরুণ থেকে যুবা। বাবা মারা গেলেন। কিন্তু মহাপুরুষ হওয়ার প্রক্রিয়া চলতে থাকল। গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি গায়ে জড়িয়ে খালি পায়ে পিচ-ঢালা রাস্তা দিয়ে হাঁটা, জোছনা রাতে হাঁ করে জোছনা গেলা। এগুলো সবই আমার মহাপুরুষ হওয়ার প্রক্রিয়ার অংশ। বাবা তাঁর মৃত্যুর আগে আমার হাতে একটি ডাইরি ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পড়তে বলেছিলেন। সেটাকে অবশ্য ডাইরি না বলে উপদেশনামা বলা ভালো। জীবনে চলার নানা উপদেশ তিনি আমার জন্যে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন সেই ডাইরিটিতে। এই উপদেশনামার একটি উপদেশ ছিল এ রকম :

"প্রিয় সুবোধ,

তুমি যখন এই উপদেশগুলি পড়িতেছ, তখন আমি আর নাই। যতদিন আমি ছিলাম তোমাকে নিজে থাকিয়া পথ দেখাইয়াছি, কিন্তু এখন আর উহা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তোমার জন্যে এই উপদেশনামাটি রাখিয়া গেলাম। কখনো যদি কোনো সমস্যা তোমার সামনে আসিয়া পড়ে, তখন এই উপদেশনামা খুলিয়া দেখিবা।

তোমার জন্যে আমার প্রথম উপদেশ এখন আমি বলিব। স্মরণ রাখিও এই জগৎ খুবই ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং ইহার মায়ায় কখনোই নিজেকে জড়াইবা না। হাঁসের মতো হইবা, জগতের মায়ায় ডুব দিবা ঠিক, শরীরে মায়া মাখিবা না। আশা করিতেছি এতদিনে তুমি বুঝিয়া গিয়াছ যে, কোনো কিছুই উদ্দেশ্য ছাড়া হয় না। এই পৃথিবীতে তুমি যে আসিয়াছ, ইহারও কোনো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। তোমার কাজ হইল সেই উদ্দেশ্যটি খুঁজিয়া বাহির করা। নিজেকে সব সময় প্রশ্ন করিবা, তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় যাইবা? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজিয়া বাহির করা এবং তাহার উপর নিজের জীবন পরিচালনা করাই হইবে তোমার লক্ষ্য। আমি তোমাকে তোমার লক্ষ্যে পৌঁছাইতে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছি এবং মৃত্যুর পরও এই উপদেশনামা দ্বারা সাহায্য করিব। কিন্তু তোমাকে কোনো পথ বাতলাইয়া দিব না। পথ তোমার নিজেরই খুঁজিয়া লইতে হইবে। মহাপুরুষ হইতে হইলে এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া বাহির করা এবং উহার উপর চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি চাই তুমি যখন এই ধরণি ত্যাগ করিবা তখন তুমি মহাপুরুষ হইয়াই ধরণি ত্যাগ করিবা। সবার সন্তান ডাক্তার হয়, ইঞ্জিনিয়ার হয়, চোর হয়, ডাকাত হয়— তুমি হইবা মহাপুরুষ।"

ইতি তোমার বাবা

আমি মহাপুরুষ হতে পেরেছি কি না জানি না, তবে কুরআন পড়ার পর আব্দুল্লাহ হয়ে গেছি। 'আব্দুল্লাহ' অর্থ আল্লাহর গোলাম। সুবোধ থেকে আব্দুল্লাহ হওয়ার এই প্রক্রিয়াটি জটিল কোনো প্রক্রিয়া নয়। প্রথম প্রথম আমার পরিবর্তনগুলো আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখত; পরে মানিয়ে নিয়েছে। এখন সবাই আমাকে 'আব্দুল্লাহ' নামেই ডাকে।

রাত দুটা বাজে। আমার কাছে এটা তেমন কোনো গভীর রাত না। বলা যেতে পারে রাতের শুরু হয়েছে মাত্র। কিন্তু ঢাকা শহরের মানুষগুলো আমার মতো রাত জাগে না। রাত দুটা তাদের কাছে গভীর রাত। বেশির ভাগ মানুষই শুয়ে পড়েছে। যাদের সামনে SSC, HSC পরীক্ষা তারা বই সামনে নিয়ে ঝিমুচ্ছে। আর কিছু যুবক-যুবতি কম্পিউটারের দিকে দুচোখ বড় বড় করে তাকিয়ে ফেইসবুকিং করছে।

আমি হাঁটছি। বলা যেতে পারে একরকম হনহন করেই হাঁটছি। গভীর রাতে মানুষজন সব সময়ই কিছুটা দ্রুত হাঁটে। এমনিতে যাদের হাঁটার গতি কিছুটা মন্থর তারাও গভীর রাতে হনহন করেই হাঁটে। পশুদের ব্যাপারটা ভিন্ন। রাতে তারা হাঁটে মন্থর গতিতে। তবে আমার এই হনহন করে হাঁটার পেছনে বিশেষ কারণ আছে। নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাজ্জুত নামাযে নাকি এক রাকাতে দাঁড়িয়ে এত বড় তেলাওয়াত করতেন যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দিতেন। আজ আমিও তা-ই চেষ্টা করতে গিয়েছিলাম। বড় সূরাগুলো এখনো ভালোমতো আয়ত্ত করতে পারিনি। আমার মুখস্থ আছে ৯১ নম্বর সূরা থেকে শুরু করে ১১৪ নম্বর সূরা পর্যন্ত। এই সূরাগুলো দিয়েই মাসজিদের বারান্দায় নামায শুরু করে দিলাম। টার্গেট ছিল এত ধীরে এবং কন্সেনট্রেশন দিয়ে আজকে দু-রাকাত তাহাজ্জুতের নামায আদায় করব যাতে মিনিমাম এক ঘণ্টা সময় লেগে যায়। আমি যখন নামায শুরু করলাম তখন রাত একটা চল্লিশ। বেশ ধীরগতিতে নামায শেষ করে মাসজিদের বারান্দার দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি দুটা বাজে মাত্র। এত ধীরে নামায আদায় করার পরও সময় লাগল মাত্র বিশ মিনিট। ঠিক তখন বুঝতে পারলাম আমার খিদে পেয়েছে। প্রচণ্ড খিদে। আমি বেরিয়ে পড়লাম। ভাত খেতে ইচ্ছে করছে। এখন খুঁজলে কিছু রেস্তোরাঁ খোলা পাওয়া যাবে। শক্ত শক্ত হয়ে যাওয়া ভাত, টক হয়ে যাওয়া কাচ্চি হয়তো-বা পাওয়া যাবে। তবে খেতে হবে নগদ টাকায়। এত গভীর রাতে কাস্টমারদের কোনো হোটেলওয়ালা বিনে পয়সায় খাওয়ায় না। এইখানেই আমার সমস্যা। এবং সমস্যা বেশ জটিল। সমস্যাটা হচ্ছে— আমার গায়ে যে জোব্বাটা আছে তাতে কোনো পকেট নেই। পকেটবিহীন এই জোব্বাটা আইশার বাবা আমায় কিনে দিয়েছেন। বেশ দৃষ্টিনন্দন জিনিস। গোলগলা, গলার কাছে সুতোর দারুণ কাজও আছে। সমস্যা একটাই—এই জোব্বাটার কোনো পকেট নেই। ইতিপূর্বে জোব্বাটার এই ত্রুটির দিকে আইশার বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই তিনি বললেন, 'পকেটের তোমার আবার দরকার কী বলো তো?'

মুরুব্বিদের প্রায় সব যুক্তিই আমার কাছে খুব কঠিন যুক্তি বলে মনে হয়। কাজেই

আমিও বললাম তাই তো, পকেটের আবার দরকার কী!

আইশার বাবা তির্যক হেসে বললেন, 'তুমি তো সেই নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সাহাবিদের (রা) প্রাচীন জামানার ইসলাম পালন করতে চাও। তা তাঁরা যে জোব্বা পড়তেন তাতে কি পকেট থাকত?'

আইশার বাবা কথাটা বলেছেন বিদ্রুপের সুরে, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই আমি জানি না। আসলেই তো? নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সাহাবিরা যে পোশাক পড়তেন তাতে কি আমাদের মতো এ রকম পকেটের ব্যবস্থা ছিল? আমি মুরুব্বির কথার বিপরীতে কিছু বললাম না। শুধু চোখে এর উত্তর জানি না এমন ভঙ্গিমা এনে ক্যাবলা মার্কা একটা হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে, পকেট না থাকলেও জোব্বাটা আমার বেশ মনে ধরেছে। আমি খুশি খুশি ভাব এনে পকেটবিহীন জোব্বাটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছি। তারপর মুরুব্বির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হয়ে গেছি। আর তারপর থেকেই না খেয়ে আছি। যখন পকেটে টাকা থাকে তখন অনেক বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়। তারা চা খাওয়ায়, সিঙ্গারা খাওয়ায়, কেউ কেউ ভাত-গোশত-মাছ খাওয়াতে পীড়াপীড়ি করে। তবে আজ যেহেতু পকেট নেই এবং টাকা নেই, কাজেই পরিচিত কারও সাথে দেখাও হয়নি। বুঝতে পেরেছি এ হলো আল্লাহর পরীক্ষা। ধৈর্য ধরতে হবে। কেননা, ধৈর্যশীলদের আল্লাহ পছন্দ করেন।

আমি এখন অবশ্য ভাত খেতে ছোট ফুপার বাসায় যেতে পারি। রাত সোয়া দুটার দিকে কলিং বেল টিপে তাদের ঘুম ভাঙালে কী পরিস্থিতি তৈরি হবে তা আগেভাগে আঁচ করা মুশকিল। ছোট ফুপার বাড়িতে আমার পদচারণা বর্তমানে নিষিদ্ধ আছে। হুজুর হওয়ার পর থেকেই ছোট ফুপা তার বাড়িতে আমার যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি কিছুদিন পর পরই আমাকে তার বাড়িতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই মুহূর্তে আমি ছোট ফুপার বাড়ির নিষিদ্ধজন। কাজেই আমাকে দেখে তিনি খুব আনন্দিত হবেন এই ধরনের ধারণা করা অলীক কল্পনা। সম্ভাবনা শতকরা আশি ভাগ যে তিনি বাড়ির দরজা খুললেও গ্রিল খুলবেন না। গ্রিলের আড়াল থেকে হুংকার দেবেন গেট আউট। গেট আউট। পাঁচ মিনিটের মধ্যে গেট আউট... না হয় বন্দুক বের করব। বন্দুক বের করা তার কথার কথা না। ঢাকার এডিশনাল আইজি তার বন্ধু মানুষ। তাকে দিয়ে তিনি সম্প্রতি বন্দুকের একটা লাইসেন্স করিয়েছেন এবং একটা দোনালা রাইফেল কিনেছেন। বন্দুক কিনেই এডিশনাল আইজি বন্ধুকে সাথে নিয়ে পাখি শিকারের পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু বন্দুক হাতে ফুপা কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলেই উত্তেজনায় তার বুক ধড়ফড় শুরু হয়ে যায়। তাই পাখি শিকারের এই

পরিকল্পনা অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত রেখেছেন। সেই দোনালা বন্দুক তার এখনো ব্যবহার করার সুযোগ হয়নি। পাখি শিকার না করতে পারলে কি হয়েছে, তিনি বেশ আগ্রহ নিয়েই দোনালা বন্দুক চালানোর সুযোগের অপেক্ষায় আছেন।

এরপর আর বাকি থাকে—জাহানারা ফুপু। 'সূর্যের চেয়ে বালি গরম' এর মতো। ছোট ফুপার চেয়ে তিনি আরও বেশি গরম। ঢাকার এডিশনাল আইজির সাথে তার বন্ধুত্ব থাকলে তিনি একটা একে ফর্টি সেভেন এর লাইসেন্স নিয়ে ফেলতেন। এখানে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই।

তবে ভরসার কথা—আজ বৃহস্পতিবার। দেওয়ানবাগীর মুরিদ ছোট ফুপা প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে আয়োজন করে খানিক জিকির-আজকার করেন। খুব আগ্রহ নিয়ে করেন। কিন্তু ডাক্তারের দেয়া পাওয়ারফুল ঘুমের ওষুধের কারণে প্রায়ই অল্প কিছুক্ষণ পর ঝিমিয়ে পড়েন। বড় বড় নিশ্বাস নিতে নিতে তখন বিড়বিড় করে জিকির বাদ দিয়ে হিন্দি কাওয়ালি গানের সুর ধরেন। এত রাতে কলিং বেলের শব্দ শুনলে তারা কেউ দরজা খুলতে আসবে না। আসবে অভি এবং সে একবার দরজা খুলে আমাকে ঢুকিয়ে ফেললে আর কোনো সমস্যা হবার কথা না।

ছোট ফুপার বাড়ির কাছাকাছি এসেই টহল পুলিশের মুখোমুখি হয়ে গেলাম। ইদানীং টহল পুলিশদের গাড়ি দেয়া হয় টহল দেয়ার জন্যে, কিন্তু এদের কাছে গাড়ি নেই। এরা হেঁটে হেঁটে টহল দিচ্ছে। দলে তারা চার জন। আগে দুজন দুজন করে টহলে বেরুত। ইদানীং টেররিস্ট আতঙ্ক এত বেড়েছে, বোধ হয় দুজন করে বের হতে সাহস পাচ্ছে না... চার জন করে বের হচ্ছে। আমাকে দেখেই তারা থমকে দাঁড়াল এবং এমন ভঙ্গি করল যেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টেররিস্টকে এইমাত্র গলির মুখে খুঁজে পাওয়া গেছে। দলের একজন, বোধ করি সবচেয়ে ভিতুজন—কারণ ভিতুরাই বেশি চেঁচিয়ে কথা বলে—চেঁচিয়ে বলল, কে যায়রে? পরিচয় কী?

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং অত্যন্ত বিনয়ের ভঙ্গিতে বললাম, আসসালামু আলাইকুম। আমি আব্দুল্লাহ। আপনারা কেমন আছেন? ভালো?

পুলিশের পুরো দলটাই হকচকিয়ে গেল। পুলিশ-আর্মি এদের সমস্যা হচ্ছে—বেজায়গায় কুশল জিজ্ঞেস করলেই এরা ভড়কে যায়। যেকোনো ভড়কে যাওয়া প্রাণীর চেষ্টা থাকে অন্যকে ভড়কে দেয়ার। কাজেই পুলিশদের একজন আমার দিকে রাইফেল তাক করে কর্কশ গলায় বলল, পকেটে কী?

আমি আগের চেয়ে বিনয়ী গলায় বললাম, আমার কোনো পকেটই নেই।

ফাজলামি করিস? হারামজাদা! থাবড়া দিয়া দাঁত ফালাইয়া দিমু।

দাঁত ফেলবেন ভালো কথা। পুলিশ এবং দন্ত-চিকিৎসকরাই তো দাঁত ফেলবে... এরা ফেলবে না তো কে ফেলবে। নাপিত এসে তো আর দাঁত ফেলবে না, নাপিত ফেলবে চুল। তবে দাঁত ফেলার আগে দয়া করে একটু পরীক্ষা করে দেখুন। সত্যিই আমার পকেট নেই।

এক জন পরীক্ষা করার জন্যে এগিয়ে এল। সারা শরীর হাতিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গীদের বলল—ওস্তাদ এই বেটার শইল্যে তো আসলেই পকেট নাই।

শইল্যে আমার পকেট কীভাবে থাকবে? আমি তো ক্যাংগারু না, আমি মানুষ। Homosepience। ক্যাংগারুরা বাচ্চা পকেটে নিয়া ঘুরে, আমরা ঘুরি কোলে নিয়া।

ওস্তাদ পকেট ছাড়া জোব্বা পইরা বহুত পট পট করতেসে, একটা টিপা দিয়া দিমুনি?

যাকে ওস্তাদ বলা হচ্ছে সে সম্ভবত দলের প্রধান এবং সবচেয়ে জ্ঞানী। সে বলল, এইডা তো রিজেক্টেড জোব্বা। এই বেকুব, সস্তায় কিনা পকেট ছাড়া জোব্বা পইরা ঘুরতাছস। এই চল, থানায় চল।

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম—জি চলুন। আপনারা কোন থানার আন্ডারে? শের-এ-বাংলা নগর থানা?

পুলিশের দলটা বিস্মিত হয়ে গেল। থানায় যাবার ব্যাপারে আমার মতো আগ্রহী কোনো টেররিস্ট তারা বোধ হয় ইতিপূর্বে খুব বেশি পায়নি।

কী নাম বললি?

আব্দুল্লাহ।

কই যাস?

ভাত খেতে যাই।

রাত দুইটায় ভাত খাইতে যাস?

স্যার ভাত তো সব সময়ই খাওয়া যায়। সময় এখানে মুখ্য বিষয় না।

ওস্তাদ যাকে বলা হচ্ছে সেই ওস্তাদ এগিয়ে আসছে। পেছন থেকে একজন বলল, ওস্তাদ, বাদ দেন। পীর-ফকিরের মুরিদ মনে হয়। দুইডা থাবড়া দিয়া চইলা আসেন।

ওস্তাদের মনে হয় সে রকমই ইচ্ছা। ব্যাট দিয়া ছয় মারার আনন্দ আর গালে থাবড়া মারার আনন্দ বোধ হয় কাছাকাছি। টহল পুলিশের ওস্তাদ এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে কেন?

জোরালো একটা থাবড়া খেলাম। চোখে অন্ধকার দেখার মতো থাবড়া। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। 'আল্লাহু আকবার' বলে চিৎকার দিতে গিয়েও দিলাম না। এদের আর ভড়কে দিয়ে লাভ নেই। ওস্তাদ থাবড়া দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। আমি আন্তরিকভাবে বললাম, আরেকটা থাবড়া দিয়ে যান, শুনেছি এক থাবড়া খেলে নাকি বিয়েশাদি হয় না—যদিও ইসলামে এসব কথার ভিত্তি নেই। তারপরও একটা যখন দিয়েছেন, আরেকটা কষ্ট করে দিয়ে যান। আধুরা কাজ রাখবেন কেন!

পুলিশের দল থেকে একজন বলল, ওস্তাদ, চইলা আসেন।

স্পষ্টতই ওরা ঘাবড়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি ঘাবড়ে গেছেন ওস্তাদ। আমি বললাম, নিরীহ মানুষকে চড়-থাপ্পড় দিয়ে চলে যাবেন—এটা কেমন কথা।

ওস্তাদ দলের কাছে চলে যাচ্ছে। আমিও যাচ্ছি তার পেছনে পেছনে। যদিও উল্টো দিকে যাওয়াই সমীচীন। পুলিশের দল যেন কিছুই হয়নি এ ভঙ্গিতে হাঁটা শুরু করেছে। আমি ওদের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটছি। আমি শিওর এখন তারা তাদের টহলের গাড়িটাকে দারুণ মিস করছে। তারা আমার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে রাস্তা ক্রস করল। আমিও রাস্তা ক্রস করলাম।

এই, তুই চাস কী?

আমি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, আরেকটা থাপ্পড় দিয়ে দিন বাসায় চলে যাই। পুলিশের দল কিছু না বলে আবার হাঁটা শুরু করেছে। আমিও তাদের পেছনে পেছনে যাচ্ছি। কোনো দলের মধ্যে একজন ভয় পেলে সেই ভয় সবার মধ্যে আস্তে আস্তে সঞ্চারিত হয়। এদেরও তা-ই হচ্ছে। এদের মধ্যে ভয়ের চারা বপন করা হয়েছে, যা এখন ডালপালা মেলে বৃক্ষ হচ্ছে। চার জন পুলিশ, দুজনের হাতে রাইফেল। অথচ ওরা এখন আতঙ্কে আধমরা। আমার মজাই লাগছে। আমি একটা আরবি সুরেলা

নাসিদ মনে করার চেষ্টা করলাম। মনে আসছে না। ক্ষুধার্ত অবস্থায় নাসিদ টাসিদ মাথায় আসতে চায় না। তবু চেষ্টা করে যাচ্ছি। আরবি একটা নাসিদ আমি ভালোই গাইতে পারি।... জুন্দুল্লাহ।

নাসিদে টান দেবার কারণে খিদে মনে হয় একটু কমেছে। ছোট ফুপার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। পুলিশের দল হুট করে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল।

আমি প্রায় দৌড়ে গলির মুখে গিয়ে বললাম, ভাইজান, আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। ফের মিলেঙ্গে ইনশা-আল্লাহ। এরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। আমার সামান্য বাক্য দুটোর মর্মার্থ নিয়ে তারা চিন্তা-ভাবনা করবে। আজ রাতের টহল তাদের ভালো যাবে না। আজ তারা ভয়ার্ত থাকবে।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো—ছোট ফুপার বাড়ির প্রতিটি বাতি জ্বলছে। এত রাতেও বাড়ির সব বাতি জ্বলার অর্থ হলো—হয় সে বাড়িতে কারও বিয়ে হচ্ছে, আর না হয় বড় কোনো বিপদ নিশ্চয়ই। মরা বাড়িতেও সব বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়। অভি হুট করে এখন বিয়ে করবে বলে মনে হচ্ছে না। বিয়ে বাড়ি আর মরা বাড়ির একটা কমন ব্যাপার হলো, দুটোতেই আত্মীয়-স্বজন গিজগিজ করে। এখানে তেমন মনে হচ্ছে না। আমি এখানে বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। কোনো একটা সমস্যা নিশ্চয়ই হয়েছে। আমি সেই সমস্যায় উপস্থিত হয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলব, 'ভাত খাব'। সেই বলাটাও আরেকটা সমস্যা। আজ বোধ হয় কপালে ভাত নেই। পুলিশের থাপ্পড় খেয়েই রাত পার করতে হবে। আমি কলিং বেলে হাত রাখলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা খুলে গেল। ছোট ফুপা তার ফরসা ছোট-খাটো মুখটা বের করে ভীত চোখে আমার দিকে তাকালেন। পরক্ষণেই আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, আরে আব্দুল্লাহ! তুই! আয় আয়, ভেতরে আয়। এই শোনো দেখো কে এসেছে? আব্দুল্লাহ এসেছে, আব্দুল্লাহ।

সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছিল সিঁড়ি ভেঙে পরবে। সবাই একসঙ্গে নেমে আসছে। কিছুক্ষণ আগে পুলিশকে ভড়কে দিয়ে এখন নিজেই ভড়কে যাচ্ছি।

গ্রিলের দরজা খুলতে খুলতে ছোট ফুপা বললেন, কেমন আছিসরে?

ফুপার গলায় আমার জন্যে রাজ্যের মায়া। ডাকার সময় যেই মায়া নিয়ে 'রে'তে টান দিলেন তাতে আমার দুচোখ বেয়ে অশ্রু নেমে আসার জোগাড়। একজন 'প্রবেশ নিষেধ' মানুষের জন্যে হঠাৎ এই মায়ার উদ্ভব এর কারণটা না জানা পর্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছি।

কিরে বললি না তো কেমন আছিস?

ভালো আছি ফুপা, আলহামদুলিল্লাহ।

বাড়ির অন্যরাও চলে এসেছে। আঠারো উনিশ বছরের একজন তরুণকে দেখা যাচ্ছে। ছেলেটি এমনভাবে আমাকে দেখছে, যেন আমি আসলে আগ্রার তাজমহল। হেঁটে শের-এ-বাংলা নগর চলে এসেছি।

ফুপা বললেন, হেন জায়গা নেই তোকে খোঁজা হয়নি। কোথায় ছিলি?

আমি নির্বিকার ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করলাম। নির্বিকার ভঙ্গি ঠিক ফুটল না। আমার জন্যে এই পরিবারটির প্রবল আগ্রহের আসল কারণটা না জানলে সহজ হওয়া যাচ্ছে না। সামথিং ইজ রং, ভেরি রং।

অভি ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। ওর কোনো খোঁজ না পেয়ে আমাকে খোঁজা হচ্ছে। আজকাল দাড়ি-টুপিসহ ছেলেপুলেরা তিন দিনের জন্যে তাবলিগে গেলেও বাবা-মায়ের মন আঁকুপাঁকু করতে থাকে—এই আবার টেররিস্ট হয়ে গেল নাকি। অভি দাড়ি রেখেছে। টাখনুর ওপর পায়জামা পরে ঘুরে বেড়ায়। বেশ বড় চুলও রেখেছে। খুব সিরিয়াসলি ইসলাম প্র্যাকটিস করছে। অভির হারিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ আমার মাথায় আসছে না। আমার ইসলাম প্র্যাকটিস শুরু করার পর থেকে অভিও ইসলাম প্র্যাকটিস শুরু করেছে। সুতরাং অভি বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে বলেই ধরে নেয়া যায়। এ ছাড়া আমার জন্যে এত ব্যস্ততার দ্বিতীয় কোনো কারণ হতে পারে না। ইসলাম প্র্যাকটিস শুরু করার পর থেকেই আমি এ বাড়ির নিষিদ্ধজন। ইদানীং টেলিভিশনে সচেতনতামূলক বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের কারণে এ বাড়ির দরজা আমার জন্য আরও বেশি বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু আমি নিষিদ্ধ নই; আমার ছায়াও এখন এ বাড়িতে নিষিদ্ধ।

আমি ফুপুর দিকে তাকিয়ে বললাম, অভি কোথায়? অভিকে তো দেখছি না। শুয়ে পড়েছে?

ফুপা-ফুপু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। ফুপা বললেন, ও ঘরেই আছে।

শরীর ভালো না? অসুখ করেছে নাকি?

না। আব্দুল্লাহ তুই বস, তোর সঙ্গে কথা আছে। চা-কফি কিছু খাবি?

চা অবশ্যই খাব, তবে ভাত-টাত খেয়ে তারপর খাব। ফুপু, রাতে কী রান্না

করেছেন? রাতের বাড়তি খাবার নিশ্চয়ই ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছেন?

ফুপু গম্ভীর গলায় বললেন, আর রান্না-বান্না! দুদিন ধরে খাবারের কথা চিন্তাও করতে পারছি না।

কেন? কাহিনিটা কী?

ফুপা গলা পরিষ্কার করছেন—যেন অস্বস্তির কোনো কথা বলতে যাচ্ছেন। গলার টানেল পরিষ্কার করে নিতে হচ্ছে।

বুঝলি, আমাদের ওপর দিয়ে বিরাট বিপদ যাচ্ছে। হয়েছে কী, অভি তার বন্ধুর বোনের বিয়েতে গিয়েছিল। ওই বিয়ে খেতে গিয়েই কাল হয়েছে। গলায় কাঁটা ফুটেছে।

গরুর রেজালা খেয়ে গলায় হাড় ফুটতে পারে ফুপা। কাঁটা ফুটবে কেন?

আরে বলিস না, কাঁটাই ফুটেছে। বেশি কায়দা করতে গিয়ে ওরা বাঙালি বিয়ের আয়োজন করেছে—মাছ, ভাত, ডাল, দই। ফাজিল আর কি, বেশি বেশি বাঙালিপনা।

অভির গলার সেই কাঁটা এখন আর বেরুচ্ছে না?

না।

ডাক্তার দেখিয়েছেন?

ডাক্তার দেখাব না মানে! বলিস কী? হেন ডাক্তার নেই যাকে দেখানো হয়নি। আজ সকালেও একজন নাক-কান-গলা স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। হাঁ করিয়ে চিমটা ঢুকিয়ে নানা কসরত করেছে। প্রায় ঘণ্টা খানেক বিভিন্ন কায়দা-কানুনের পর বেচারা হাল ছেড়ে বলেছে কাঁটা অনেক নিচে; চিমটা দিয়ে ধরতে পারছে না। দুদিন ধরে অভি কিছুই খাচ্ছে না। ঘুমোচ্ছে না। কী যে বিপদে পড়েছি!

বিপদ তো বটেই।

তোর ফুপু গোলাপ শাহের মাজার থেকে খাওয়ার গোলাপজল পড়িয়ে এনেছিল। ওটাও খালি পেটে পশ্চিম দিকে মুখ করে গোলাপ শাহ বাবার নামে একনিশ্বাসে খাওয়ানো হয়েছে। কিছুই বাদ নেই।

অভি এই পানি খেয়েছে।

ও যদি জানত তাহলে কি আর মুখে দিত নাকি। কৌশলে খাওয়ানো হয়েছে।

এটা তো শিরক হয়ে গেল।...

চিকিৎসা আবার শিরক হয় কীভাবে, তুই এইসব উগ্রতা ছাড় তো, আমরা আছি টেনশনে, সে আসছে শিরক-বিদাত শিক্ষা দিতে।

এটা সম্পূর্ণ শিরক ফুপা। এবং এটা বর্জনীয়। আচ্ছা এ রকম আর কোনো কিছু কি করা হয়েছে?

কী আর বলব তোকে লজ্জার কথা। পীর সাহেবের মুরিদদের মধ্যে আমার এক জাকেরিন ভাই বলেছিল বিড়ালের পায়ে ধরে মাফ চাইলে গলার কাঁটা নেমে যাবে। তার মতে গ্রাম-বাংলার মানুষ গত হাজার হাজার বছর ধরে কাঁটা ফুটলেই বিড়ালের পায়ে ধরছে। কাজেই এর একটা গুরুত্ব আছে। কাঁটা হচ্ছে বিড়ালের খাদ্য। আমরা সেই খাদ্য খেয়ে বিড়ালের প্রতি একটা অবিচার করছি। সে জন্যেই বিড়ালের পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

ছেলের হালত দেখে সে সময় জাকেরিন ভাইয়ের কথাগুলো আমার কাছে বেশ যুক্তিযুক্তই লেগেছে।

ভালো কথা, তাহলে কি অভিকে বিড়ালের পায়েও ধরানো হয়েছে?

ফুপা থমথমে গলায় বলল, বিড়ালের পায়েও ধরানো হয়েছে। সে-ও এক কেলেংকারি কাণ্ড। বিড়াল খামচি দিয়ে রক্ত বের করে দিয়েছে। এটিএস দিতে হয়েছে। এখন তুই একটা ব্যবস্থা করে দে।

আমি?

ফুপু বলল, হু। অভির ধারণা, তুই-ই নাকি একটা ব্যবস্থা করতে পারবি। তোর ফুপা ওকে ব্যাংককের বামরুংগ্র্যাড হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। ও তোর সঙ্গে দেখা না করে যাবে না। হেন জায়গা নেই যে তোর খোঁজ করা হয়নি। তোকে হঠাৎ আসতে দেখে বুকে পানি এসেছে। দুটা দিন গেছে, ছেলে একটা কিছুও মুখে দেয়নি। আরও কয়েকটা দিন এ রকম গেলে তো ও মরে যাবে।

ফুপুর কথা শেষ হবার আগেই অভি ঘরে ঢুকল। চুল উস্কখুস্কু, চোখ বসে গেছে। ঠিকমতো দাঁড়াতেও পারছে না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বললাম, খবর কিরে?

অভি ফ্যাকাশে ভঙ্গিতে হাসল। সাহিত্যের ভাষায় এই হাসির নাম করুণ হাসি।

আমি বললাম, কিরে, শেষ পর্যন্ত মাছের হাতে পরাজিত?

অভি তার মুখ আরও করুণ করে ফেলল। বসে থাক, আল্লাহ নিশ্চয়ই উত্তম ব্যবস্থা করবেন। আমি আগে গোসল করে খাওয়া-দাওয়া করে নিই, তারপর তোর সমস্যা ট্যাকেল করব ইনশা-আল্লাহ।

অভির মুখ মুহূর্তের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে গেল। পাশের সেই তরুণ ছেলেটির ঠোঁটের কোনায় ব্যঙ্গ হাসির আভাস। তবে সে কিছু বলল না। এ বাড়ির পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ আমার অনুকূলে। এ রকম অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ না করা নিতান্তই বোকামি হবে। আমি ফুপুর দিকে তাকিয়ে বললাম, গোসল করব। ফুপু, আপনার বাথরুমে হট ওয়াটারের ব্যবস্থা আছে না?

গিজার নষ্ট হয়ে গেছে। যা হোক, পানি গরম করে দিচ্ছি। গোসল করে ফেল। গোসল করে ভাত খাবি তো?

হু।

তাহলে ভাত-টাত যা আছে গরম করতে দিই।

ঘরে কি পোলাওয়ের চাল আছে?

আছে।

তাহলে চট করে পোলাওয়ের চাল চড়িয়ে দিন। নতুন আলু নিশ্চয়ই আছে। নতুন আলু ভালো করে ভাজা খেতে দারুণ স্বাদ। কুচি কুচি করে আলু কেটে বেশি করে গুঁড়ো মরিচ দিয়ে ডুবা তেলে কড়া করে ভাজা। গরম ভাত, আলুভাজার সঙ্গে এক চামচ গাওয়া ঘি। খেতে এক্সেলেন্ট হবে। গাওয়া ঘি আছে না বাসায়?

ঘি নেই।

মাখন আছে?

হু।

অল্প আঁচে মাখন ফুটাতে থাকেন। গাদ যেটা বের হবে তা ফেলে দেবেন, এক্কেবারে এক নম্বর গাওয়া ঘি তৈরি হবে। কয়েকটা শুকনো মরিচ ভাজলে মন্দ হয় না। ঘিয়ের মধ্যেই ভাজবেন।

অভির কাঁটাটার কিছু করা যায় কিনা দেখ।

দেখব। ইনশা-আল্লাহ, সে দুদিন যখন অপেক্ষা করেছে, আরও ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করতে পারবে। পারবি নারে অভি?

অভি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়াল। মনে হচ্ছে কথা বলার মতো অবস্থাও তার নেই। আমি গুনগুন করে আবারও সেই নাসিদটা গাইতে চেষ্টা করলাম। তরুণ সেই ছেলেটা আমার দিকে তাকাচ্ছে। তার চোখের দৃষ্টি যেন কেমন! ভালো মনে হয় না। সে দৃষ্টিতে কৌতূহল আছে। শুদ্ধ কৌতূহল না, অশুদ্ধ কৌতূহল। ছেলেটা বোধ হয় একটা দৃশ্য দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে দৃশ্যটি হলো— একজন হুজুর টাইপ মানুষের পরাজিত হয়ে লজ্জা পাওয়ার মজাদার দৃশ্য। পুলিশের মতো এই ছেলেটাকেও ভড়কে দিতে পারলে ভালো লাগত। কিন্তু পারছি না। এ বয়সের ছেলেগুলো এত সহজে ভড়কায় না। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার নাম কী?

ইরাম।

শোনো ইরাম, তোমার যদি কোনো কাঁটার ব্যাপার থাকে, গলায় কাঁটা বা হৃদয়ে কাঁটা, আমাকে বলো। তোমার কাঁটারও একটা ব্যবস্থা করা যায় নাকি দেখি।

ইরাম কঠিন ভঙ্গিতে বলল আমার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি গোসল করতে যান, আপনাকে গরম পানি দেয়া হয়েছে।

কীভাবে সম্ভব। এত ঝটপট তো পানি গরম হওয়ার কথা না।

খাওয়ার জন্যে পানি ফুটানো হয়েছে, ওই পানিই দেয়া হয়েছে।

জাযাকাল্লাহু খাইর, মেনি থ্যাংকস।

আমি খেতে বসেছি। চেয়ারে বসেই অভিকে ডাকলাম, অভি খেতে আয়। অভির জন্যে একটা প্লেট দেখি।

ফুপা বললেন, ও তো ঢোকই গিলতে পারছে না। ভাত খাবে কী? তুই তো ওর

ব্যাপারটা বুঝতেই পারছিস না।

আমি ফুপাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ডাকলাম, অভি আয়।

অভি উঠে এল। আমার আদেশ অগ্রাহ্য করা অন্য সবার পক্ষে সম্ভব হলেও অভির পক্ষে সম্ভব না। আমি অন্য সবাইকে সরে যেতে বললাম।

শোন অভি, এখন ঘরে যা, ভালো করে ওজু করবি, তারপর দু-রাকাত নফল নামায পড়বি। নামায শেষ করে আল্লাহর কাছে তোর এই দুর্দশার কথা খুলে বলবি। যদিও তিনি জানেন, তারপরও ভালো করে তাঁর কাছে চাইতে হবে। ভিক্ষুকের মতো করে চাইতে হবে। কান্নাকাটি করা ভিখারির জন্যে তো মানুষেরই দয়া হয়। আর আল্লাহ তো দয়ার সাগর। দেখবি অবশ্যই আল্লাহ সহজ করে দেবেন। তাড়াতাড়ি যা, তুই এলে তোকে নিয়ে খাওয়া শুরু করব। দারুণ খিদে পেয়েছে।

অভি ধীরপায়ে তার ঘরে চলে গেল। আমি কোথায় যেন গলার কাঁটা দূর করার একটা দোয়া দেখেছিলাম। খুব সম্ভবত সূরা ওয়াকিয়াহর একটা আয়াত পড়ে আগে মানুষ গলায় কাঁটা বিঁধলে ঝাড়ত। কিন্তু গলায় কাঁটা বিঁধলে এ আমলটি কতটুকু সহিহ তা জানি না। এর কোনো নির্ভরযোগ্য দলিল আছে কি না তা-ও আমার জানা নেই। তাই সহজ বুদ্ধিতে দু-রাকাত নফল নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে বলাটাকেই বুদ্ধিমানের কাজ মনে হলো। আমিও গোসল সেরে দু-রাকাত নফল আদায় করে আল্লাহর কাছে বলেছি। দেখা যাক, আল্লাহ তাকদিরে কী রেখেছেন।

অল্প সময় পরই অভি চলে এল।

অভি শোন, তোর পেটে খিদে, তুই বিসমিল্লাহ বলে শুরু কর। গলায় ব্যথা করে—করুক। কিছু যায় আসে না। আপাতত কিছু সময়ের জন্যে গলাটাকে পাত্তা দিবি না। আল্লাহর ওপর ভরসা কর। তাঁকে যেহেতু বলেছিস, আশা করি তিনি অবশ্যই ঠিক করে দেবেন। কাঁটা থাকুক কাঁটার মতো, তুই থাকবি তোর মতো। বুঝতে পেরেছিস?

হু।

আরাম করে দুই ভাই একসঙ্গে ভাত খাব। ভাত খওয়ার পর আমরা মিষ্টি পান খাব। জর্দা ছাড়া। তারপর দেখি তোর কাঁটার কী করা যায়।

আব্দুল্লাহ ভাই, খাওয়ার আগে কাঁটার কিছু একটা ব্যবস্থা করলে হয় না?

হয়। আগে করলেও হয়, তাতে কাঁটাটাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। আমরা ফুলকে গুরুত্ব দেবো। কাঁটাকে না। ঠিক না?

ঠিক।

আয় খাওয়া শুরু করা যাক। অভি ভাত মাখছে। আমি বললাম, 'বিসমিল্লাহ' বলেছিস?

অভি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়াল।

শুকনো মরিচ ভালো করে ডলে নে—ঝালের চোটে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে পানি না বের হলে ঝাল খাওয়ার মজা কী। শুরু করা যাক...

বিসমিল্লাহ...

অভি খাওয়া শুরু করল। কয়েক লোকমা খেয়েই হতভম্ব গলায় বলল— আব্দুল্লাহ ভাই, কাঁটা চলে গেছে বলে মনে হচ্ছে!

'চলে গেলে গেছে। এতে আকাশ থেকে পড়ার কী আছে? আল্লাহকে বলেছিলি, আল্লাহ তোর দোয়া কবুল করেছেন। বল, আলহামদুলিল্লাহ।

অভি বলল, আলহামদুলিল্লাহ।

এখন খাওয়া শেষ কর।

বাসার সবাইকে আগে খবরটা দিয়ে আসি।

এটা এমন কোনো বড় খবর না যে, মাইক বাজিয়ে শহরে ঘোষণা দিতে হবে। আরাম করে খা তো। আলুভাজিটা অসাধারণ হয়েছে না?

অমৃতভাজির মতো লাগছে।

ঘি দিয়ে চপচপ করে খা—ভালো লাগবে।

আজ তুমি না এলে আমি হয়তো মরেই যেতাম। আমি সবাইকে বলেছি আব্দুল্লাহ ভাই-ই কেবল পারে এই কাঁটা দূর করতে। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করেনি।

শোন অভি, আব্দুল্লাহ ভাই কিচ্ছু পারে না। যা করেন আল্লাহই করেন। 'আমি না

এলে তুই মরে যেতি’ এভাবে আর বলবি না—এটা শিরক হয়ে যায়, বুঝলি।

জি।

ইরাম তো তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছিল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আমি যখন বললাম আব্দুল্লাহ ভাই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন। আর তাই হয়তো আল্লাহ তার দুয়া কবুল করেন। তখন হাসতে হাসতে সে প্রায় বিষম খায়। আজ সে সত্য বুঝবে ঠিকই, আজ তার একটা শিক্ষা হবে।

অভির চোখ ভিজে গেছে। ঝালের কারণে পানি এল, না আনন্দের পানি সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

আল্লাহর দারুণ এক সৃষ্টি মানুষের চোখের এই পানি। দুঃখ, বেদনা, আনন্দ সবকিছু প্রকাশের অদ্ভুত সুন্দর এক মাধ্যম এই চোখের পানি।